بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৫ এপ্রিল, ২০১৯ মোতাবেক ০৫ শাহাদত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজকে যেসব বদরী সাহাবীর আমি স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো হযরত খিরাস বিন সিমমা আনসারী। হযরত খিরাস খাযরাজ গোত্রের বনু জোশম শাখার সদস্য ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে হাবীব। তার সন্তানসন্ততির মাঝে রয়েছেন সালামা, আব্দুর রহমান এবং আয়েশা। হযরত খিরাশ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের যুদ্ধে তিনি ১০টি আঘাত পান। তিনি মহানবী (সা.) এর সুদক্ষ তিরন্দাজদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বদরের যুদ্ধে হযরত খিরাস মহনবী (সা.) এর জামাতা আবুল আস'কে বন্দি করেছিলেন।

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত উবায়েদ বিন তাইয়েহান। তার নাম আতিক বিন তাইয়েহানও বলা হয়ে থাকে। তার মায়ের নাম ছিল লায়লা বিনতে আনীক। তিনি হযরত আবুল হাইসাম বিন লাইয়েহান এর ভাই ছিলেন। তিনি বনু আব্দুল আশআল এর মিত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উবায়েদ ৭০জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশ নিয়েছেন। মহানবী (সা.) তার এবং হযরত মাসুদ বিন রবী-র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। তিনি তার ভাই হযরত আব্দুল হাইসাম এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। ইকরামা বিন আবু জাহল তাকে শহীদ করে। এটিও বলা হয় যে, তিনি সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষ থেকে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু উভয় রেওয়ায়েতের অভিন্ন মত হলো তিনি শহীদ হয়েছেন। তার সন্তানসন্ততির মাঝে দুই পুত্র হযরত উবায়দুল্লাহ্ এবং হযরত আব্বাদ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাবরীর বর্ণনা অনুসারে হযরত আব্বাদও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আর হযরত উবায়দুল্লাহ্ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত আবু হান্না মালেক বিন আমর। আবু হান্না ছিল তার ডাকনাম। মালেক বিন আমর ছিল তার আসল নাম। মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদি তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে গণ্য করেছেন। তার নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তার নাম আমের ও সাবেত বিন নো'মানও বর্ণিত হয়েছে। তার ডাকনাম আবু হাব্বা এবং আবু হাইয়াও বর্ণনা করা হয়। কিন্তু মুহাম্মদ বিন ওয়াকদি বলেন যে, আবু হাইয়া ডাকনামের দুই ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন আবু হাব্বা বিন গাযিয়া বিন আমর আর দ্বিতীয়জন হলেন আবু হাব্বা বিন আবদে আমর আল মায্নি। তাদের কেউই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কারো ডাকনামই আবু হাব্বা ছিল না, বরং বদরের যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের ডাকনাম হলো আবু হান্না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তার কথার ওপর জোর দিচ্ছেন যে, তার ডাকনাম ছিল আবু হান্না।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বিন সালেবা। তাকে আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী বলা হয়। তার ডাকনাম ছিল আবু মুহাম্মদ। তার পিতার নাম ছিল হযরত যায়েদ বিন সালেবা আর তিনিও সাহাবী ছিলেন। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু জোশম শাখার সদস্য ছিলেন। তিনি ৭০জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশ নেন আর বদর, ওহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় বনু হারেস বিন খাযরাজ এর পতাকা তার হাতে ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবী লিখতে জানতেন। অথচ সেই যুগে আরবে লেখার রীতি অনেক কম ছিল। খুব কম মানুষই লিখতে জানতো। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ এর সন্তানসন্ততি মদিনাতেই অবস্থান করে। তার এক পুত্রের নাম ছিল মুহাম্মদ, যিনি তার স্ত্রী সাদা বিনতে খুলায়েব এর গর্ভজাত। আর এক মেয়ে ছিল উম্মে হুমায়েদ, যার মা ইয়ামেনবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হুরায়েস বিন যায়েদ ছিলেন তার ভাই, যিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। তার এক বোনের নাম ছিল কুরায়বা বিনতে যায়েদ। তিনিও সাহাবীয়া ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ সেই সাহাবী যাকে স্বপ্নে আযানের বাক্যাবলী অবহিত করা হয়েছে আর তিনি মহানবী (সা.)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত বেলালকে সেই নির্দিষ্ট বাক্যে আযান দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যা হযরত আব্দুল্লাহ্ স্বপ্নে দেখেছিলেন। এটি ১ হিজরী সনে মহানবী (সা.) কর্তৃক মসজিদে নববী নির্মাণের পরের ঘটনা। এই ঘটনার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ হলো আনসারদের মধ্য থেকে হযরত আবু উমায়ের বিন আনাস আনসারী তার চাচার বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) নামাযের জন্য লোকদের একত্রিত করার উপায় সম্পর্কে ভাবেন। তাঁকে বলা হলো যে, নামাযের সময় একটি পতাকা উত্তোলিত করা হোক। মানুষ পতাকা দেখে পরস্পরকে অবহিত করবে। এই প্রস্তাব তাঁর (সা.) পছন্দ হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) এর কাছে সিঙ্গা-র কথা উল্লেখ করা হলো। অর্থাৎ ইহুদীদের ডাকার রীতি সম্পর্কে বা জোরে ফু দেয়ার রীতি সম্পর্কে বলা হলো। কিন্তু তিনি (সা.) এটিও পছন্দ করেন নি, কেননা এটি ইহুদীদের রীতি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁর কাছে ঘন্টা বাজানোর কথা বলা হলে তিনি বলেন, এটি খ্রিষ্টানদের রীতি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ ফিরে যান। মহানবী (সা.)-এর চিন্তার কারণে তিনিও চিন্তিত ছিলেন। তিনি দোয়া করেন। বলা হয় স্বপ্নে তাকে আযান দেখানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখি। তার হাতে ঘন্টা ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কি এই ঘন্টা বিক্রি করবে। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি এটি দিয়ে কি করবে। আমি বললাম, এর মাধ্যমে আমরা নামাযের জন্য ডাকবো। সে বললো, আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কথা অবহিত করব কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ বল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, তখন সে আযানের বাক্যাবলী শুনায়।

ٱللهُ أَكْبَر ٱللهُ أَكْبَر ٱللهُ أَكْبَر ٱللهُ أَكْبَر أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللهِ حَيَّ عَلَى ٱلصَّلَاة حَيَّ عَلَى ٱلصَّلَاة حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاح حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاح ٱللهُ أَكْبَر ٱللهُ أَكْبَر لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ

এর অনুবাদও পড়ে দিচ্ছি। শিশু এবং নবমুসলিমদের জন্য তা উপকারী হয়ে থাকে। আযান আমরা সবাই শুনি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি দেখেছি অনেকেই এর অনুবাদ জানে না। অর্থ হলো- আল্লাহ্ সর্বমহান, এটি চারবার বলতে হবে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এটি দুবার বলতে হবে। এরপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্র রসূল। এটিও দুবার বলতে হবে। এরপর নামাযের দিকে আস। حَيَّ عَلَى ٱلصَّلَاة। নামাযের দিকে আস। حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاح। সফলতার দিকে আস। সফলতার দিকে আস। আল্লাহ্ সর্বমহান। এটি দুবার বলতে হবে। এরপর لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

তিনি বলেন, এই শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির পর সেই ব্যক্তি কিছুটা পিছনে সরে যায়। এরপর পুনরায় বলে যে, আর যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন তোমরা বলো- (এখানে তকবীরের বাক্যগুলো উচ্চারণ করে বলে যে,)

ٱللهُ أَكْبَر ٱللهُ أَكْبَر أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللهِ حَيَّ عَلَى ٱلصَّلَاة حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاح قد قامت الصلاة ٱللهُ أَكْبَر ٱللهُ أَكْبَر لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ

এতে আযানের সেই শব্দগুলোই রয়েছে। অতিরিক্ত হিসেবে قد قامت الصلاة রয়েছে অর্থাৎ নামায দাঁড়িয়ে গেছে, নামায দাঁড়িয়ে গেছে। আর এরপর আল্লাহ্ সর্বমহান, আল্লাহ্ সর্বমহান।

তিনি বলেন, সকালে আমি তাঁর (সা.) সকাশে উপস্থিত হই এবং আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তা বর্ণনা করি। তিনি (সা.) বলেন, খোদার ইচ্ছায় এটি সত্য স্বপ্ন। তুমি বেলালের সাথে দাঁড়িয়ে যাও আর যা দেখেছ তা বলতে থাক। তিনি এই শব্দগুলোই আযানে বলবেন, কেননা তার কণ্ঠস্বর তোমার কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু। অতএব আমি বেলালের সাথে দাঁড়িয়ে যাই। আমি তাকে বলতে থাকি আর তিনি সে অনুসারে আযান দিতে থাকেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) যখন এই আযান শুনেন তখন তিনি নিজ গৃহেই ছিলেন। তিনি নিজের চাদর টানতে টানতে বের হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তা-ই দেখেছি যা তিনি দেখেছেন। এটি শুনে তিনি (সা.) বলেন, সব প্রশংসা মহান আল্লাহ্র। আরেকটি রেওয়ায়েতেও এই শব্দাবলী রয়েছে যে, তখন মহানবী (সা.) বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহ্র আর এটিই সুদৃঢ়-সুনিশ্চিত কথা।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে কিছু বর্ধিত কথাও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

নামাযের জন্য যখন আযান দেয়ার বা ডাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না, সাহাবীরা সচরাচর সময়ের ধারণা করে নিজেরাই নামাযের জন্য সমবেত হয়ে যেতেন। কিন্তু এটি কোন স্বস্তিদায়ক পন্থা ছিল না। মসজিদে নববীর নির্মিত হওয়ার পর এই প্রশ্নটি খুব বেশি অনুভূত হতে থাকে যে, কিভাবে মুসলমানদের একত্রিত করা যায়। কোন সাহাবী খ্রিষ্টানদের ন্যায় ঘন্টা বাজানোর পরামর্শ দেয়। কেউ ইহুদীদের আদলে সিঙ্গা বাজানোর প্রস্তাব দেয়। কেউ কোন কথা বলে, কেউ ভিন্ন কোন কথা। কিন্তু হযরত উমর (রা.) পরামর্শ দেন যে, কোন ব্যক্তিকে এই ঘোষণা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হোক যে, নামাযের সময় হয়ে গেছে। মহানবী (সা.) এই মতামতকে পছন্দ করেন। আযান নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে একটি মতামত এটিই ছিল। হযরত বেলালকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এ অনুসারে এরপর

যখন নামাযের সময় হতো তখন বেলাল উচ্চস্বরে **'আসসালাতু জামে'** বলে ঘোষণা করতেন। আর মানুষ সমবেত হতো। বরং নামায ছাড়াও কোন উদ্দেশ্যে যদি মুসলমানদেরকে মসজিদে সমবেত করতে হতো তাহলে এভাবেই ডাকা হতো আর এই ঘোষণাই করা হতো। এর স্বল্পকাল পর এক সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারীকে বর্তমান আযানের বাক্যাবলী শিখানো হয়েছে (অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে) আর তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে এসে নিজের এই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে আযান হিসেবে এই বাক্যগুলো বলতে শুনেছি। তিনি (সা.) বলেন, এই স্বপ্ন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে। আর বেলালকে এই শব্দগুলো শিখানোর জন্য আব্দুল্লাহ্কে নির্দেশ দেন। তিনি লিখেন, আশ্চর্জজনক দৈব বিষয় যা ঘটেছে তা হলো হযরত বেলাল যখন আযানের নির্ধাতি শব্দে আযান দিলেন তখন হযরত উমর তড়িঘড়ি করে মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আজকে বেলাল যেসব বাক্যে আযান দিয়েছেন হুবহু এসব বাক্যই আমি স্বপ্নে দেখেছি। আরেকটি রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন আযানের শব্দগুচ্ছ শুনলেন তখন বলেন, এ সম্পর্কে ওহীও হয়েছে।

বশীর বিন মুহাম্মদ নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ, যাকে স্বপ্নে আযান দেখানো হয়েছিল, তিনি তার সেই সম্পদ সদকা করেন যা ছাড়া তার কাছে আর কোন কিছু ছিল না। অর্থাৎ পুরো সম্পদ সদকা করে দেন। তিনি এবং তার পুত্র এই সম্পদের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। এটিই অর্থাৎ যে সম্পদই ছিল, সেটিই তাদের উপার্জনের মাধ্যম ছিল। অতএব তিনি সেই সম্পদ মহানবী (সা.) এর হাতে তুলে দেন। যখন তিনি তার সম্পদ দান করে দেন তখন তার পিতা মহানবী (সা.) এর কাছে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজের সম্পদ সদকা করেছেন, অথচ তিনি এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদকে ডেকে বলেন, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা'লা তোমার কাছ থেকে তোমার সদকা গ্রহণ করেছেন। তুমি যা আল্লাহ্র খাতিরে দান করেছ তা তিনি গ্রহণ করেছেন। এখন তুমি তা উত্তরাধিকার হিসেবে তোমার পিতামাতাকে ফিরিয়ে দাও। বশীর বলেন, এরপর আমরা তা উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি। অর্থাৎ পরবর্তীতে তার সন্তানরা এভাবে তা থেকে অংশ পেয়েছে। একবার মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদকে নিজের নখ তাবাররুক হিসেবে প্রদান করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের পুত্র মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, তার পিতা মহানবী (সা.) এর কাছে বিদায় হজ্জের সময় মিনা'র ময়দানে 'মানহার' অর্থাৎ কুরবানীর স্থানে কুরবানী করার সময় উপস্থিত ছিলেন আর তার সাথে আনসারদের মধ্য থেকে অপর এক ব্যক্তিও ছিলেন। মহানবী (সা.) কুরবানী সমূহ বণ্টন করলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ এবং তার আনসারী সাথি কিছুই পান নি। এরপর মহানবী (সা.) নিজের চুল কামিয়ে একটি কাপড়ে রাখেন আর সেগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর নখ কাটেন এবং সেগুলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী এবং তার সাথিকে প্রদান করেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! খোদার কসম, নিশ্চয় আপনি আমার কাছে আমার নিজ সত্তার চেয়েও প্রিয় এবং আপনি আমার কাছে আমার পরিবারের চেয়েও প্রিয়, আর আপনি আমার কাছে আমার সন্তানদের

চেয়েও প্রিয়। আমি বাসায় ছিলাম আর আপনাকে স্মরণ করছিলাম। আমি ধৈর্য্য ধারণ করতে না পেরে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি আর এখন আমি আপনাকে দেখছি। যখন আমার নিজের ও আপনার মৃত্যুর কথা ভাবলাম তখন আমার মনে হলো যে, আপনি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন আপনাকে অপরাপর নবীদের সাথে উত্থিত করা হবে। আর আমি ভয় পাই যে, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করব তখন আপনাকে সেখানে পাব না। তখন মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তিকে কোন উত্তর দেন নি। এমনকি জিবরাঈল এই আয়াতসহ অবতীর্ণ হন যে,

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

(সূরা আন্ নিসা: ৭০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেছেন। অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই আয়াতটিকে আমরা এই দলীল হিসেবেও উপস্থাপন করি যে, মহানবী (সা.) এর আনুগত্যের মাধ্যমে শরীয়ত বিহীন নবুয়ত লাভ হতে পারে। আর তাঁর (সা.) অনুসরণ করে এক ব্যক্তি সালেহীয়তের মর্যাদা থেকে উন্নতি করে নবুয়তের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। যাহোক নবুয়তের মর্যাদা, তা শরীয়ত বিহীন নবুয়তই হোক না কেন আর মহানবী (সা.) দাসত্বে হলেও এটি অনেক উচ্চ মর্যাদা, আর আল্লাহ্ তা'লা যাকে চান তা প্রদান করেন। এছাড়া আগমনকারী মসীহ্ মওউদ সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) নবীউল্লাহ্ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমরা মহানবী (সা.) এর দাসত্বে শরীয়ত বিহীন নবী হিসেবে মানি। আর এতে মহানবী (সা.) এর খতমে নবুয়তের মর্যাদার কোন হানি হয় না, বরং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় কেননা এখন নবুয়তও কেবলমাত্র তাঁর (সা.) দাসত্বেই লাভ হতে পারে। আর এই অর্থ শুধু আমরাই করি না, বরং অতীতের বুযুর্গরাও করেছেন। অতএব ইমাম রাগেবও এর এই অর্থই করেছেন যে, মহানবী (সা.) এর পর তাঁর অনুবর্তীতায় শরীয়ত বিহীন নবী আসতে পারে। যাহোক এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে এর উল্লেখ আমি এজন্য করলাম যেন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

আল্লামা যুরকানি লিখেছেন যে, বিভিন্ন তফসীর গ্রন্থে মহানবী (সা.) এর দাস হযরত সো'বান সম্পর্কে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, অথচ তফসীর 'ইয়াম্বুউল হায়াত'-এ মাকাতেল বিন সোলেমান সম্পর্কে লেখা আছে যে, তিনি ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী, যিনি স্বপ্নে আযান দেখেছিলেন। আল্লামা যুরকানি লিখেন যে, যদি এই কথা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে হতে পারে যে, উভয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে এমন কথার উল্লেখ করে থাকবে, যার ফলে এই আয়াত নাযেল হয়েছে। এছাড়া এটিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, এমন কথা মহানবী (সা.) এর বেশ কয়েকজন সঙ্গী বলেছিলেন।

প্রথমে বর্ণিত ঘটনা ছাড়া তফসীর ইত্যাদিতে হযরত সো'বান এর ঘটনা এবং শব্দাবলীও বর্ণিত হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ হলো- হযরত সো'বান মহানবী (সা.) প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। আর তাঁর (সা.) কাছ থেকে দূরে থাকা তিনি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারতেন না। একদিন তিনি যখন মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হন তখন তাকে ভিন্নরকম দেখাচ্ছিল আর তার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট ছিল। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, কী কারণে তোমাকে এমন দেখাচ্ছে? হযরত সো'বান নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এছাড়া আমার কোন রোগ নেই আর আমি কোন ব্যাধিতেও আক্রান্ত

নই যে, আমি আপনাকে দেখতে পারি নি, অর্থাৎ তিনি কিছুকাল তাঁকে (সা.) দেখতে পান নি, এ কারণে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি যতক্ষণ না আপনার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। অনুরূপভাবে যখন পরকালের কথা আমার স্মরণ হয় তখন আমার ওপর পুনরায় ভীতি ছেয়ে যায় যে, আমি আপনাকে দেখতে পারব না কেননা আপনাকে তো নবীদের সাথে উত্থিত করা হবে। আর আমি যদি জান্নাতে যাইও তাহলেও আমার মর্যাদা আপনার মর্যাদা থেকে অনেক নিম্ন পর্যায়ের হবে। আর আমি যদি জান্নাতে প্রবেশ করতে না পারি তাহলে আমি কখনো আপনাকে দেখতে পারবো না। এ ছিল সো'বান সম্পর্কে বিস্তারিত।

আল্লামা যুরকানি লিখেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজ বাগানে কর্মরত ছিলেন, এখানে পুনরায় আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের উল্লেখ আরম্ভ হচ্ছে, এমন সময় তার পুত্র তার কাছে আসেন এবং তাকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তিনি বলেন, **আল্লাহুম্মাযহাব বাসরী হাত্তা লা আরা বা'দা হাবীবি মুহাম্মাদা আহাদা**। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যাও, যেন আমি এরপর আমার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কাউকে না দেখি। যুরকানির ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, বলা হয় এরপর ক্রমাগতভাবে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে থাকে আর তিনি অন্ধ হয়ে যান। তার মৃত্যু সম্পর্কে লেখা আছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের মৃত্যুর সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ ওহুদের যুদ্ধের পর তার মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এটি উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। আর হযরত উসমানের খিলাফতের শেষ দিকে ৩২ হিজরীতে মদিনায় তার ইন্তেকাল হয়েছে। আর তার দৃষ্টি সংক্রান্ত ঘটনাকেও যদি সঠিক মনে করা হয়, তা থেকেও বুঝা যায় যে, হযরত উসমানের যুগেই তার ইন্তেকাল হয়েছে। তখন তার বয়স ছিল ৬৪ বছর। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযা পড়িয়েছেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্। হযরত মুআয বিন আমর বনু খাযরাজ গোত্রের বনু সালমা শাখার সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আত আর বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার পিতা আমর বিন জমুহ্ মহানবী (সা.) এর সাহাবী ছিলেন, যিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। তার মায়ের নাম ছিল হিন্দ বিনতে আমর। মুসা বিন উকবা, আবু মা'শার এবং মুহাম্মদ ওয়াকদি'র মতে তার ভাই মুআভেয বিন আমরও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আর তার স্ত্রীর নাম ছিল সুবায়তা বিনতে আমর, যিনি বনু খাযরাজের বনু সায়েদা শাখার সদস্যা ছিলেন। তার ঘরে তার এক পুত্র আব্দুল্লাহ্ এবং এক কন্যা উমামা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুআয আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে যোগদান করেছেন। কিন্তু তার পিতা আমর বিন জমুহ্ তার পৌত্তলিক বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সীরাত ইবনে হিশামে হযরত মুআয এর পিতার ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত ঘটনায় উল্লিখিত আছে যে, বছরকাল পূর্বে তার ঘটনায় এটি আমি কিছুটা উল্লেখ করেছি যে, আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণকারীরা যখন মদিনায় ফিরে আসে তখন তারা ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। কিন্তু তাদের কতক জ্যেষ্ঠ তখনও নিজেদের পৌত্তলিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মাঝে একজন ছিল আমর বিন জমুহ্। তার পুত্র মুআয বিন আমর আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর তখন তিনি মহানবী (সা.) এর হাতে বয়আত করেছিলেন। আমর বিন জমুহ্ বনি সালামার সর্দারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাদের জ্যেষ্ঠদের একজন ছিলেন। তিনি তার ঘরে

একটি কাঠের মূর্তি বানিয়ে রেখেছিলেন, যেভাবে সে যুগের বড়লোকেরা বানিয়ে রাখতো। এটিকে মানাত বলা হতো। সেটিকে উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করে তার মাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা ঘোষণা করা হতো। বনু সালমার কিছু যুবকের ইসলাম গ্রহণের পর, যাদের মাঝে হযরত মুআয বিন জাবাল এবং আমর বিন জমুহ্‌র পুত্র মুআয বিন আমর বিন জমুহ্‌ও ছিলেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আকাবার দ্বিতীয় বয়আতেও অংশগ্রহণ করেছেন, তারা রাতের বেলা আমর বিন জমুহ্‌র দেবালয়ে ঢুকে সেই মূর্তিকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন আর সেটিকে বনু সালমার ময়লা আবর্জনার গর্তে উপুড় করে শুইয়ে দেন বা ফেলে দেন। সকালবেলা আমর যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখন বলতেন, তোমাদের অমঙ্গল হোক। কে রাতের বেলা আমাদের উপাস্যদের সাথে শত্রুতা করেছে? এরপর সেটিকে সন্ধানের উদ্দেশ্যে বের হতেন এবং সেটিকে যখন আবর্জনার গর্তে পেতেন তখন সেটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। এরপর বলতেন যে, আমি যদি এটি জানতে পারি যে, কে তোমার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করেছে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত করব। এরপর আবার রাত নেমে আসলে আমর যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখন তার পুত্র একই কাজ করতেন। পুনরায় সকালে উঠে আমর বিন জমুহ্‌ একই কষ্ট সহ্য করে সেটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। বেশ কয়েক রাত এই ঘটনা ঘটার পর আমর বিন জমুহ্‌ প্রতিমাকে যেখানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেখান থেকে বের করে পুনরায় সেটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করেন। এরপর তিনি নিজের তরবারি আনেন এবং প্রতিমার কাঁধে ঝুলিয়ে দেন এবং বলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি না কে তোমার সাথে এমন করে। অতএব তোমার মাঝে যদি কোন শক্তি থাকে তাহলে তাকে বাধা দাও আর এই তরবারি তোমার কাছে রইল, অর্থাৎ তারবারি সেটির কাছে রেখে দেন। সন্ধ্যাবেলা আমর যখন ঘুমিয়ে পড়েন, সেই যুবকরা, যাদের মাঝে আমরের পুত্রও ছিল, সেই প্রতিমার সাথে আবার একই ব্যবহার করে আর এক মৃত কুকুর এনে রশি দিয়ে সেটিকে মূর্তির সাথে বেঁধে দেয় এবং বনু সালমার একটি পুরোনো কূপে সেটিকে ফেলে দেয় যাতে ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি ফেলা হতো। সকালবেলা আমর বিন জুমহ্‌ উঠে সেই প্রতিমাকে সেখানে পাননি যেখানে সেটিকে রাখা হতো। তিনি সেটির সন্ধান করতে থাকেন এবং সেটিকে কূপের ভিতর মৃত কুকুরের সাথে বাঁধা অবস্থায় পান। এই দৃশ্য দেখার পর তার সামনে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর তার জাতির মুসলমানরাও তাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করে। তখন তিনি আল্লাহ্‌র কৃপায় ইসলাম গ্রহণ করেন। সীরাত ইবনে হিশাম-এ এই ঘটনা এভাবেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ এই প্রতিমা তো তরবারি থাকা সত্ত্বেও কিছুই করতে পারে নি, এমন খোদার পূজা বা উপাসনা করে লাভ কি।

হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্‌ আবু জাহলকে হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বুখারীর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, সালেহ্‌ বিন ইব্রাহীম তার দাদা আব্দুর রহমান বিন অউফের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বদরের যুদ্ধের সারিতে দণ্ডায়মান ছিলাম। আমি আমার ডানে ও বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দুজন স্বল্পবয়স্ক আনসার কিশোরকে দেখি। তিনি বাসনা ব্যক্ত করেন যে, হায়! আমি যদি এমন লোকদের মাঝে থাকতাম যারা এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী দেহের অধিকারী টগবগে যুবক। ততক্ষণে তাদের একজন আমার হাতে চাপ দিয়ে বলে যে, চাচা, আপনি কি আবু জাহলকে চেনেন? আমি বললাম হ্যা, কিন্তু ভাতিজা, তার সাথে তোমার কী? সে উত্তর দেয়, আমাকে বলা হয়েছে যে, সে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) কে গালি দেয় আর সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ,

আমি যদি তাকে দেখতে পাই তাহলে আমার চোখ ততক্ষণ তার চোখ থেকে সরবে না যতক্ষণ আমাদের দু'জনের মাঝে সে নিহত না হবে যার মৃত্যুর সময় পূর্বে নির্ধারিত। আমি এতে খুবই আশ্চর্যান্বিত হই। এরপর দ্বিতীয় জনও আমার হাতে চাপ দেয় আর সে-ও একইভাবে প্রশ্ন করে। স্বল্পক্ষণ পরেই আমি আবু জাহলকে মানুষের মাঝে ঘোরাফেরা করতে দেখি। আমি বললাম, ঐ হলো তোমাদের সাথি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করেছ। এ কথা শুনতেই তারা উভয়ে নিজেদের তরবারি নিয়ে তার দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় আর তাকে আক্রমণ করে উভয়েই তাকে হত্যা করে। এরপর তারা উভয়েই মহানবী (সা.) এর কাছে ফিরে আসে এবং তাঁকে (এ সম্পর্কে) অবহিত করেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদের মাঝে কে তাকে হত্যা করেছে। তাদের উভয়ে বলেন যে, আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছ। তারা উত্তর দেন যে, না। তিনি (সা.) তরবারি দেখে বলেন যে, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। তার গনিমতের মাল মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ পাবেন, আর তাদের উভয়ের নাম ছিল মুআয। অর্থাৎ মুআয বিন আফরা এবং মুআয বিন আমর বিন জমুহ্। আমি প্রারম্ভেও একবার মুআয এবং মুআভেয এর ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। এখানে কিছুটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে তাই বলছি যে, এই নিহত হওয়ার ঘটনা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আর এই রেওয়ায়েত যা বুখারী থেকে বর্ণিত হয়েছে তাতে উল্লেখ আছে যে, হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ এবং মুআয বিন আফরা আক্রমণ করে আবু জাহলকে হত্যা করেছিলেন। আর হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ আবু জাহলের শিরোচ্ছেদ করেছিলেন। অন্য স্থানে মুআয এবং মুআভেয এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া বুখারীতে এমন রেওয়ায়েতও রয়েছে যাতে উল্লেখ আছে যে, আফরা-র দুই পুত্র মুআয এবং মুআভেয তাকে হত্যা করেছেন। আর পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ গিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন। বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে,

হযরত আনাস বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন বলেছেন, আবু জাহল সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য কে যাবে? হযরত ইবনে মাসুদ যান এবং গিয়ে দেখেন যে, তাকে আফরা-র দুই পুত্র মুআয এবং মুআভেয তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে, যার কারণে সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ছিল। হযরত ইবনে মাসুদ তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি আবু জাহল? হযরত ইবনে মাসুদ বলেন, আমি আবু জাহলের দাড়ি ধরি। আবু জাহল বলে যে, আমার চেয়েও বড় কোন ব্যক্তি আছে কি যাকে তোমরা মেরেছ? অথবা বলে যে, এই ব্যক্তির চেয়ে বড় কেউ আছে কি যাকে তার জাতি মেরে থাকবে? এই উভয় রেওয়ায়েত বুখারীতে রয়েছে। এক জায়গায় উভয় নামই মুআয বর্ণিত হয়েছে, আরেক জায়গায় মুআয এবং মুআভেয বর্ণিত হয়েছে। এক স্থানে উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন পিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে আরেক স্থানে উভয়েই একই পিতার পুত্র আখ্যায়িত হন।

যাহোক হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব আবু জাহলের হত্যাকারীদের বিষয়ে এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে এবং ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, আফরার দুই পুত্র মুআয এবং মুআভেয আবু জাহলকে মৃত্যুমুখে পৌঁছিয়েছে। পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইমাম ইবনে হাজর এই সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন যে, মুআয বিন আমর এবং মুআয বিন আফরা-র পর মুআভেয বিন আফরা-ও তার ওপর আঘাত হেনে

থাকবে। তাই প্রথম দুই রেওয়ায়েতে উভয় ভাইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর অন্য রেওয়ায়েতে দুই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়। আর বুখারীর তফসীর ফতহুল বারি-তে লিপিবদ্ধ আছে যে, হয়ত তাদের তিনজনই থেকে থাকবেন। আল্লামা বদরউদ্দিন আইনি আবু জাহলের হত্যাকারী সংক্রান্ত কথাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে বলেন, আবু জাহলকে মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ আর মুআয বিন আফরা এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ হত্যা করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ তার শিরোচ্ছেদ করেন এবং মহানবী (সা.) এর কাছে নিয়ে আসেন।

আল্লামা বদরউদ্দিন আইনি লিখেন, সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, যে দুই ব্যক্তি আবু জাহলকে হত্যা করেছে তারা হলেন মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ এবং মুআয বিন আফরা। মুআয বিন আফরা-র পিতার নাম ছিল হারেস বিন রিফা আর আফরা ছিলেন তার মা, যিনি উবায়েদ বিন সালেবা নাজ্জারিয়া-র কন্যা ছিলেন। একইভাবে বুখারীর জিহাদ অধ্যায়ে বাব 'মাললা ইয়ুখাম্মেসুল আসলাব'-এ উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মুআয বিন আমরই আবু জাহলের পা কেটে ফেলেন এবং তাকে ফেলে দেন। এরপর মুআভেয বিন আফরা তাকে আঘাত করেন এবং ভূপাতিত করেন আর তাকে ছেড়ে দেন। তার মাঝে তখনও জীবনের স্পন্দন ছিল। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ মোক্ষম আঘাত হেনে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তিনি আরো লিখেন যে, যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, এসব কথা একসাথে বর্ণনা করার প্রয়োজন কী? তাহলে আমি বলবো যে, আবু জাহলের হত্যায় হয়ত এদের সবার ভূমিকা ছিল তাই একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

যুরকানি-র একটি বর্ণনা অনুসারে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ আবু জাহলকে এমন অবস্থায় পেয়েছেন যখন সে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ছিল। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ তার পা আবু জাহলের ঘাড়ে রেখে বলেন, হে আল্লাহ্র শত্রু আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। তখন আবু জাহল অহংকারসূচক ভঙ্গিতে বলে, আমি তো লাঞ্ছিত হই নি। আমার চেয়ে সম্মানিত কাউকে তোমরা হত্যা করেছ কি? অর্থাৎ আমি তো এতে কোন লজ্জাবোধ করছি না। এরপর আবু জাহল জিজ্ঞেস করে যে, বল তো দেখি যুদ্ধে কে জয়যুক্ত হয়েছে, বিজয় ও সাফল্য কার পদচুম্বন করেছে? তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ উত্তর দেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল বিজয়ী হয়েছেন।

আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে, আবু জাহল বলল, তাকে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলো যে, আমি সারাজীবন তার শত্রু ছিলাম আর আজ অর্থাৎ এখনও আমি তার প্রতি চরম শত্রুতা ও বৈরিতা পোষণ করি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) আবু জাহল এর শিরোচ্ছেদ করেন আর তার মস্তক নিয়ে যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন তখন মহানবী (সা.) বলেন, যেভাবে আমি আল্লাহ্র সন্নিধানে সকল নবীর চেয়ে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাবান আর আমার উম্মত আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অন্য সকল উম্মতের চেয়ে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাশীল, অনুরূপভাবে এই উম্মতের ফেরাউন অন্য সকল উম্মতের ফেরাউনদের চেয়ে বেশি কঠোর ও উগ্র। এর কারণ হলো,

حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ(সূরা ইউনুস: ৯১)

পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনুসে এসেছে যখন (পানি) তাকে নিমজ্জিত করতে আরম্ভ করলো, তখন সে বললো, আমি ঈমান আনছি যে, "কেবল তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই যার প্রতি বণী ইস্রাঈল ঈমান এনেছে।" যদিও এই উম্মতের ফেরাউন শত্রুতা এবং কুফরীতে

অনেক এগিয়ে আছে, যেভাবে মৃত্যুর সময় আবু জাহলের কথা থেকেও প্রতীয়মান হয়। এছাড়া অন্যান্য রেওয়ায়েতে একথার উল্লেখও পাওয়া যায় যে, আবু জাহলের ধ্বংসের সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) আবু জাহলের (কর্তিত) মস্তক দেখার পর বলেন, اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ (সূরা আল্ হাশর:২৩) অর্থাৎ **"আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই।"** একইভাবে তিনি (সা.) তিনবার এটিও বলেন যে, **"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আআয্যাল ইসলামা ওয়া আহলাহু।"** অর্থাৎ সকল প্রশংসার অধিকারী হলেন আল্লাহ্, যিনি ইসলাম ও এর অনুসারীদের সম্মান দিয়েছেন। অনুরূপভাবে এ উল্লেখও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) বলেন, নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মতের একজন ফেরাউন রয়েছে আর এই উম্মতের ফেরাউন ছিল, আবু জাহল; যাকে আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত লজ্জ্যকরভাবে ধ্বংস করিয়েছেন।

হযরত উসমান (রা.)'র যুগে হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্'র ইন্তেকাল হয়। খলীফা বিন খায়াত বর্ণনা করেন যে, বদরের (যুদ্ধের) দিন মুআয বিন আমর বিন জমুহ্'র (দেহে) একটি আঘাত লেগেছিল এরপর তিনি হযরত উসমান (রা.)'র যুগ পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন আর এরপর মদিনায় ইন্তেকাল করেন। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযা পড়ান এবং তিনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ কতইনা উত্তম একজন মানুষ"। আল্লাহ্ তা'লা এসব লোকের ওপর সহস্র সহস্র রহমত ও কৃপা বর্ষণ করুন, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয় রসূলের ভালোবাসায় বিভোর হয়ে তাদের প্রিয়ভাজন হয়েছেন।

নামাযের পর আমি এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, এটি হলো শ্রদ্ধেয় মালেক সুলতান হারুন খান সাহেবের জানাযা। ২৭শে মার্চ ইসলামাবাদে তার মৃত্যু হয়েছিল, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বড় পুত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র জামাতা, অর্থাৎ তাঁর (খলীফাতুল মসীহ্ রাবের) ছোট মেয়ের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। মালেক সুলতান হারুন সাহেব জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল কর্ণেল মালেক সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেব, যিনি ১৯২৩ সনে ২৩ বছর বয়সে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র হাতে বয়আত করেছিলেন আর নিজ পরিবারে একমাত্র আহমদী ছিলেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'ই তাকে শ্রদ্ধেয়া আয়েশা সিদ্দিকার সাথে বিয়ে করান যিনি চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেবের কন্যা ছিলেন। এই পরিবারটি পাঞ্জাবের সম্ভ্রান্ত বংশগুলোর মধ্যে একটি বড় নবাব পরিবার ছিল। মালেক আমীর মুহাম্মদ খান সাহেব, যিনি পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন এবং নবাব কালা বাগ নামে সুপরিচিত ছিলেন, তিনি কর্ণেল মালেক সুলতান মুহাম্মদ সাহেবের পিতার চাচাতো ভাই ছিলেন। তার দাদার নাম ছিল মালেক সুলতান সরখরু খান। সে সময় বৃটিশ রাজত্ব ছিল। তখন ভারত ও পাকিস্তান তাদের উপনিবেশ ছিল। সেসময় নবাব হিসেবে তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদাও ছিল। তার পুত্র মালেক সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেবের চার বছর পর আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। প্রকৃতিগত পুণ্য ছিল, দুনিয়াদার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের প্রতি আকর্ষণ জন্মে আর আল্লাহ্ তা'লা সেই পুণ্যের কল্যাণে তাকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করেন। সুলতান হারুন খান সাহেবের বিয়ে হয়েছে সাবীহা হামীদ সাহেবার সাথে, যিনি ওয়াপদায় জিএম হিসেবে কর্মরত চৌধুরী আব্দুল হামীদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার বিয়ে পড়িয়েছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) নিকাহ্র এলান করার সময়

একথাও বলেছিলেন যে, চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেব, যিনি ইংল্যাণ্ড মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ও প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় বুযূর্গ ছিলেন, আমার প্রতি তার অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, আমার অল্পবয়সে এবং অভিজ্ঞতাশূন্য বয়সে তিনি আমাকে নিজের সাথে নিয়ে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতাকে ব্যাপকতর করার অনেক সুযোগ সৃষ্টি করেছেন আর গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীদের জন্য আমার হৃদয়ে যে প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা ছিল তাদের সেই আকর্ষণকে প্রকাশ করার সুযোগও চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেবের সাথে থাকার কারণেই আমার লাভ হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, এখনও গ্রামের একজন সাধারণ মানুষের সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় তখন তার সাথে অকৃত্রিমভাবে কথা বলতে আমি যে আনন্দবোধ করি এক শহরবাসীর সাথে সাক্ষাতে আমি সেই আনন্দ অনুভব করি না। কেননা, শহরের লোকদের কৃত্রিমতার অভ্যাস থাকে আর তাদের এই অভ্যাসের কারণে তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় অজান্তে আমরাও কৃত্রিমতার আশ্রয় নেই। তিনি বলেন, যাহোক, আজ আমার এই অনুগ্রহকারী বুযূর্গের দৌহিত্র মালেক সুলতান হারূন খানের বিয়ে যার পিতা হলেন কর্ণেল সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেব। আমি তার নিকাহ্র এলান করবো। এরপর বলেন, বন্ধুরা দোয়া করুন- যেভাবে আমাদের জ্যেষ্ঠরা কামানাবাসনামুক্ত হয়ে খোদার ধর্মের নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন সেই একই সেবার প্রেরণা এবং সেই ত্যাগ-তিতিক্ষার চেতনা যেন তাদের বংশধরদের মধ্যেও বজায় থাকে এবং তা যেন চোখে পড়ার মত হয়। আজ তার মৃত্যুতে এঘটনার স্মৃতিচারণ হলো। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া থাকবে মরহুম মালেক হারূন সাহেবের সন্তানসন্ততিরাও যেন আহমদীয়াত এবং খিলাফতের সাথে সেই সম্পর্ককে শুধু রক্ষাকারীই না হন বরং আরো সুদৃঢ়কারী হোন। তার তিন পুত্র ও তিন কন্যা রয়েছে। যেমনটি বলেছি, (মরহুমের) বড় ছেলে সুলতান মুহাম্মদ খান হলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র জামাতা। এলাকার দরিদ্র জনসাধারণের অনেক সেবা করতেন, বিশেষ করে অভাবী মহিলাদের প্রতি তার অসাধারণ সদ্ব্যবহার ছিল। মহিলারা বলেছেন যে, মালেক সাহেবের জীবদ্দশায় আমরা এলাকায় নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করতাম আর এখন তার তিরোধানের পর আমাদের ভয় হচ্ছে। আটক অঞ্চলে চরম শত্রুতাও রয়েছে আর হৃদয়ের পাষণ্ডতাও অনেক বেশি। দরিদ্রদের কোন অধিকারই দেয়া হয় না। কিন্তু বড় জমিদার এবং এলাকার সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রদের তিনি অনেক সেবা করতেন। কানাডা নিবাসী তার বোন রাশেদা সাইয়্যাল সাহেবা বলেন, আমার ভাই সুলতান হারূন খান সাহেব বহু গুণের আধার ছিলেন। আহমদীয়াতের জন্য পরম আত্মাভিমান রাখতেন এবং খিলাফতের খাতিরে প্রাণ বিসর্জনকারী, বন্ধুদের সত্যিকার বন্ধু আর শত্রুদের প্রতি কঠোর ছিলেন। দরিদ্র এবং মিসকীনদের অবলম্বন ছিলেন। তিনি বলেন, একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে একটি পত্রে লিখেছেন যে, তোমার পিতা কর্ণেল সুলতান মাহমুদ খান সাহেব আহমদীয়াতের জন্য একটি নগ্ন তরবারি ছিলেন। আর তোমার ভাইদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

ঐ এলাকায় তাদের চরম শত্রুতা ছিল। এলাকায় এটিই শত্রুতার রীতি, বিভিন্ন জায়গা-জমির কারণেও শত্রুতা হয়ে থাকে, এছাড়া আহমদীয়াতের কারণেও শত্রুতা হতো, তখন একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে বলেছিলেন, গুলি আসবে কিন্তু তা উপর দিয়ে চলে যাবে, ইনশাআল্লাহ্ তোমার কিছুই হবে না। তিনি (অর্থাৎ মরহুমের

বোন) লিখেন যে, খলীফা সালেসের এই কথা আমরা পূর্ণ হতে দেখেছি। ১৯৭৭ সনে ফতেহ্ জঙ্গ পুলিশ স্টেশনে তার ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয় আর মালেক সুলতান হারুন সাহেবের ওপর গুলি চলে এবং মাথার চুল ঝলশে দিয়ে তা চলে যায় কিন্তু তার (দেহে) কোন আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। আল্লাহ্ তা'লা অলৌকিকভাবে তাকে রক্ষা করেন। দরিদ্র এবং মিসকীনদের প্রতি তিনি অনেক উদার ছিলেন। তিনি (অর্থাৎ মরহুমের বোন) আরো লিখেন যে, আর দুর্বল ও অসহায় লোকদের জন্য তিনি অবলম্বন ছিলেন।

তার (মরহুমের) বড় ভাই মালেক সুলতান রশীদ খান সাহেব বলেন, আমাদের পিতার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারের সত্যিকার অভিভাবক তিনিই। আমার সকল চেষ্টা সত্ত্বেও যখনই জামা'তের কোন কাজ হতো, তিনি সর্বদা অধমের চেয়ে অগ্রগামী থাকতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), সম্মানিত খলীফাগণ এবং জামা'তের সত্যিকার নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ছিলেন। একবার ১৯৭৪ সনের ঘটনাবলীর পর আমার সামনে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাকে বলেন, আপনাদের হযরত সাহেবের ওপর আপনার ঈমানের অবস্থা কেমন বলে মনে করেন? পাঞ্জাবীতে তিনি উত্তর দেন যে, "লোহে ওয়ারগা" অর্থাৎ খিলাফতের প্রতি আমার বিশ্বাস লোহার ন্যায় দৃঢ়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র হিজরতের সফরে তিনি করাচী পর্যন্ত সহযাত্রী ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর সাথে যাওয়ার সুযোগ হয়। রশীদ সাহেব লিখেন, আমার কাছে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র যেসব চিঠিপত্র সংরক্ষিত আছে এর মধ্য হতে একটি পত্রে হুযূর অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে আহমদীয়াতের জেনারেল আর অপর স্থানে আহমদীয়াতের জন্য ভালোবাসা ও আত্মাভিমানের নগ্ন তরবারি আখ্যা দিয়েছেন। রাতের নফল ইবাদত ও কুরআন করীম (পাঠের) যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, রশীদ সাহেব লিখেন যে, অনেক কম মানুষই এ সম্পর্কে জানবেন। কেননা ঘুণাক্ষরেও তিনি এর উল্লেখ করতেন না কিন্তু উভয় দায়িত্ব খুবই নিয়মিতভাবে পালন করতেন। তার বড় ভাই লিখেন, যদি ২০১৬ সনে আমার গুরুতর অসুস্থতার সময় আমরা দু'জন চারমাস পর্যন্ত একই কক্ষে একসাথে না থাকতাম তাহলে হয়ত আমিও জানতে পারতাম না। সে দিনগুলোতে আমার জন্য ওঠা-বসা কঠিন ছিল, উনি আমার সেবা-শুশ্রূষার জন্য একই কক্ষে আমার সাথে থাকতেন। তখন আমি তাকে যেভাবে নিয়মিত নফল পড়তে ও কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছি তা আমার জন্য খুবই মূল্যবান বিষয় ছিল। তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, আপনি যে কষ্ট করছেন তার চেয়ে আমার জন্য দু'একজন সেবক বা চাকর রাখলেই তো হতো, তারা আমার সেবা করবে। তখন তিনি বলেন, আমি যখন আপনার কাছে উপস্থিত আছি তখন আবার চাকরের কি প্রয়োজন।

এরপর রশীদ সাহেব লিখেন, পরম মানবহিতৈষী মানুষ ছিলেন। সব মিলিয়ে ৯/১০টি স্কুল নির্মাণ করিয়েছেন। কখনো এমন সময়ও এসেছে যখন আয়-উপার্জন বেশি হয়নি তাই স্কুলের জন্য দিতে পারেন নি। এমন অবস্থায় তিনি স্বয়ং একবার শ্রমিকদের সাথে শ্রমিকের কাজও করেন আর শ্রমিকদের বলেন, তোমাদের চেয়ে আমি বেশি কাজ করি। এমন কোন ভাব ছিল না যে, আমি কোন নবাবের পুত্র বা এলাকার বড় জমিদার। তার দুহিতা মাহমুদা সুলতানা কাশেফ লিখেন যে, খিলাফতের প্রতি আমার আব্বাজানের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা কোন গোপন বিষয় নয়। বোধ-বুদ্ধির বয়স হতেই নিজ পিতার কাছ থেকে উঠতে-বসতে যে শিক্ষা পেয়েছি তা হলো, খোদা তা'লার ওপর সর্বদা আস্থা রাখবে আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে কাজ নেবে, দোয়া না থাকলে কিছুই নেই। তিনি খোদা

তা'লার প্রতি অশেষ আস্থা রাখতেন। খুবই সাহসী ও নির্ভিক মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কাউকেই ভয় করতেন না। সৃষ্টিসেবায় লেগে থাকতেন।

একইভাবে তার পুত্র সুলতান মুহাম্মদ খান বলেন, আমার পিতা অনেক সামাজ সেবা করেছেন। ৮টি স্কুল নির্মাণ করিয়েছেন। ২টি কবরস্থানের জন্য জমি দিয়েছেন এবং ৮টি স্কুলের জন্য জমি দিয়েছেন। অনেক দরিদ্র মানুষের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন আর তার সন্তান-সন্ততিকেও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন আর জামাত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি (মরহুমের গায়েবানা) জানাযা পড়াবো।